National Journal of
Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177
NJHSR 2026; 1(65): 157-159
© 2026 NJHSR
www.sanskritarticle.com

Aditi Mandal
Former Student,
M.A. in Sanskrit,
University of Kalyani,
West Bengal, India

Correspondence:
Aditi Mandal
Former Student,
M.A. in Sanskrit,
University of Kalyani,
West Bengal, India

প্রাচীন ‘মনুসংহিতার’ বর্ণ-ব্যবস্থা বনাম বর্তমান সমাজে দলিত সম্প্রদায়

Aditi Mandal

Abstract :

প্রকৃতির সবটাই যেন একটি বাঁধা-ধরা নিয়মে বয়ে চলেছে। এই ভূমির সর্বাংশে পরস্পর পরস্পরের উপর যেন অনবদ্যভাবে নির্ভরশীল। তবে হ্যাঁ পুরোটাই নিয়মের বেড়াজালে। ঠিক যেমন একটি শিশুকে মানুষ করতে তার পিছনে পরিবারের অবদান থাকে তেমনি একটি সমাজ গড়তে সেই সমাজের জনগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলা ভাষায় ‘সমাজ’ শব্দটির অর্থ হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একাধিক ব্যক্তি বা চরিত্র একত্রে কিছু সাধারণ নিয়ম-কানুন, প্রথা বা স্বার্থের ভিত্তিতে বসবাস করে। এই ‘প্রথা’ কথাটির প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রাচীন থেকে আধুনিক কালের সাথে সাথে আমাদের স্বার্থে সমাজের নিয়ম-কানুন পরিবর্তিত হতে। পুরনো ‘প্রথা’ জানতে হলে আগে আমাদের প্রাচীন মুনি, ঋষিবর্গের মতে পুরনো প্রথার পরিকাঠামো রূপগুলি জানতে হবে, তবেই আমাদের কাছে বর্তমান সময়ে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তিত রূপটি বোধগম্য হবে। আর এই প্রাচীন মুনিবর্গের মধ্যে মনুর রচিত ‘মনুস্মৃতি’ নামটি আমরা সকলে অবগত। যাঁর স্মৃতিতে বর্ণিত হয়েছে সমাজ প্রথার পুরাচরিত দিকগুলি। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সমাজের ‘নিয়ম-কানুন’ তুলে ধরাই আজকের গবেষণার বিচার্যবিষয়। ‘মনুসংহিতা’ মানবধর্মশাস্ত্র নামে পরিচিত একটি প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। একটি বর্ণ-ব্যবস্থার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের মধ্যে সমাজের শ্রেণিবিন্যাসের একটি কাঠামো প্রদান করে। শ্রীমদ্ভগবৎগীতার চতুর্থ আধ্যায়ে ১৩ নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন **“চাতুর্বর্ণ্যং মযা সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশ:”**। অর্থাৎ এই চার বর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি করেছেন তাদের নিজ নিজ গুণানুসারে। এই কথা থেকে স্পষ্ট যে জন্ম অনুযায়ী বর্ণ নয়, কর্মানুযায়ী বর্ণের সৃষ্টি। কিন্তু মনুসংহিতায় বর্ণানুসারে কর্মের উল্লেখ রয়েছে। জন্ম অনুযায়ী বর্ণের ভেদ করেছে।

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাং তু বীর্যত:।
বৈশ্যানাং ধ্যানধনত: শূদ্রাণামেব জন্মত।।155।।

উচ্চবর্ণের তুলনায় জাতি, লিঙ্গ এবং নিম্ন বর্ণের (শূদ্র) অধিকারের বিষয়ে গভীরভাবে অসম, শ্রেণিবদ্ধ এবং বৈষম্যমূলক। কিন্তু আধুনিক সমাজে এগুলি এমন সব গোষ্ঠীর সাংবিধানিক পরিচয়, যারা ঐতিহাসিকভাবে সামাজিক বঞ্চনা, প্রান্তিকীকরণ এবং অস্পৃশ্যতার শিকার। ১৯৫০ সালে কার্যকর হওয়া ভারতীয় সংবিধান এই সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ। আধুনিক সংবিধান কাঠামো এবং প্রাচীন হিন্দু সামাজিক আইনের মধ্যেকার যে সংঘাত সেটি তুলে ধরায় এই প্রবন্ধের রচনার উৎস।

Keywords :

বর্ণব্যবস্থা, মনুস্মৃতি, ভারতীয় সংবিধান, আদিবাসী সম্প্রদায়।

Introduction :

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, মনু হলেন পৃথিবীর প্রথম মানব বা মানবজাতির পূর্বপুরুষ। তিনি স্বয়ম্ভুব মনু নামেও পরিচিত। প্রথম নারী শতরূপা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। মনু ও শতরূপার মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানবজাতির ধারা শুরু হয়। মনু কেবল প্রথম মানবই নন, বরং তিনি সমাজ, ধর্ম এবং আইনকানুনের প্রতিষ্ঠাতাও।

হিন্দু সমাজে জাতি বা বর্ণপ্রথা। এই শব্দটি সংস্কৃত ‘জাত’ (যার অর্থ “জন্ম” বা “অস্তিত্বে আনা”) থেকে উদ্ভুত এবং একটি জন্ম দ্বারা নির্ধারিত এক প্রকার অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। প্রথাগত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের প্রণেতারা নিজেরাই জাতিকে বর্ণ (সামাজিক শ্রেণী) হিসাবে গণ্য করার প্রবণতা দেখান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে চারটি বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) ও তাদের বংশধরদের মধ্যকার মৈত্রীর ফল হিসেবে জাতির উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

ভারতের বিভিন্ন অংশে, কিছু জাতিগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট বর্ণের সদস্যপদ দাবি করে বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে সম্মান অর্জনের চেষ্টা করেছে। এর সবচেয়ে সাধারণ এবং সফল উদাহরণ ছিল এই দাবিটি রাজপুতরা নিজেদের দ্বিতীয় বর্ণের ক্ষত্রিয় বা অভিজাত বলে দাবি করত। তফশিলি জাতিযুক্ত (যাদের দলিতও বলা হয়, পূর্বে "অস্পৃশ্য" নামে পরিচিত) সেই মানুষেরা তাদের এই শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে বর্ণপ্রথার আচার আচরণ গ্রহণ করেছে এবং শূদ্র (সর্বনিম্ন বর্ণ) মর্যাদা লাভের চেষ্টা করেছে। এই চার বর্ণ ব্যতীত কিছু অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল, তারা অবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। এরাই দলিত নামেও পরিচিত ছিল।

Objective :

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য বর্তমান সমাজেও পিছিয়ে পরা সম্প্রদায় এর-জন্য আইনগত, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা এবং সম্মানের সাথে তাদের যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠা করা।

এই ধরনের গবেষণা নিবন্ধ লেখার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ –

- **সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা –**

মনুস্মৃতিতে নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি যে অস্পৃশ্যতা, সামাজিক দূরীকরণ দেখানো হয়েছে। যেখানে ভারতীয় সংবিধান তার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সমাজে অনগ্রসর শ্রেণীকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিয়েছে। তবুও বর্তমানে সমাজে দলিত (এস.সি / এস.টি) সম্প্রদায় গুলি আয়, শিক্ষা-ব্যবস্থা ও মৌলিক পরিসেবার ক্ষেত্রে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়।

- **শিক্ষা ও উপার্জনের সুযোগ –**

স্মৃতিতে নিম্নবর্ণের মানুষের শিক্ষা গ্রহণের কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু অধুনা এই বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে অনগ্রসর শ্রেণীদের জন্য ভারতীয় সংবিধান শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়। যদিও সাংবিধানিক সুরক্ষার কারণে সরকারি চাকরিতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসন (SC দের জন্য ১৫% , ST দের জন্য ৬.৩৪% এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২২.৫% পর্যন্ত) সুবিধা রয়েছে তবুও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তারা এখনও সাধারণ জনগণের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। যার ফলস্বরূপ ভারতের সমস্ত সরকারি চাকরির আসনে সাধারণ জনগণের তুলনায় তাদের আসন সংখ্যা খুবই নগণ্য।

- **নির্যাতন ও নিরাপত্তা –**

মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি তাচ্ছিল্যতা প্রতি ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান এই বিষয়েও বিশেষ নজর প্রদান করেছে। তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন ১৯৮৯ এর প্রভাব দেখা যায়। তবে এই আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং এর অপব্যবহার রোধের প্রয়োজনীয়তা আছে।

- **ক্ষমতায়ন –**

ভূমি মালিকানা এবং শিক্ষার সুযোগ সামান্য বাড়লেও ক্ষমতায়নের প্রভাব এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও লক্ষিত হয় না। সাধারণ জনগণেরা যে ক্ষমতায়ন নিয়ে সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছে, এই সম্প্রদায়ের কাছে তা দুর্লভ।

মনুসংহিতা হলো একটি প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। যেখানে সমাজের নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহার এবং নৈতিকতার বর্ণনা আছে। এতে ১২ টি অধ্যায় এবং ২৬৮৩ টি শ্লোক আছে। মনুসংহিতার বর্ণপ্রথা, রাজার দায়িত্ব এবং নারীর স্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এতে কিছু বিতর্কিত বিষয়ও আছে, যেমন নারীর স্বাধীনতা এবং শূদ্রদের প্রতি আচরণ। স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ হলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আর শূদ্র হলেন নিকৃষ্ট। এছাড়াও মনুসংহিতায় বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন নিয়ম-কানুন এবং শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারবর্ণের কর্মানুসারে বিভাগ করা হয়েছে। এই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি প্রসঙ্গে স্মৃতিতে উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থ মুখবাহূরুপাদতঃ।
যদ্যস্য সোঽদ্ধসর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশত্।।31।।

অর্থাৎ সকল লোক সমূহকে রক্ষার জন্য ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু, পদ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি। এখানেই ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের যে পৃথকীকরণ সেটি খুব সহজেই স্পষ্ট বোঝাই যায়। এছাড়া তিনি (মনু) চার বর্ণের কর্মানুসারে ভেদকে তুলে ধরেছেন।

ব্রাহ্মণ – অধ্যয়ন (বেদাদিপাঠ), অধ্যাপনা (অন্যকে পাঠদান), যজন (স্বহিতার্থে যজ্ঞসম্পাদন), যাজন (পরহিতার্থে যজ্ঞানুষ্ঠান), দান (অন্যকে দানকর্ম) ও প্রতিগ্রহ (অন্যের থেকে দানগ্রহণ)।

ক্ষত্রিয় – অধ্যয়ন, যজন, দান, প্রজারক্ষা, যজ্ঞ, ভোগাসক্তিবর্জন।

বৈশ্য – অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, পশুরক্ষা, বাণিজ্য, কৃষিকাজ।

শূদ্র – উক্ত তিন বর্ণের সেবা।

এখানে তিন বর্ণের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদকে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। শূদ্রকে বেদ পাঠে অধিকারই দেওয়া হয়নি। বরং উচ্চ তিন বর্ণের সেবায় শূদ্রকে নিয়োগ করেছেন। এখানেই শূদ্রের প্রতি তীব্র তাচ্ছিল্য বোধ প্রকাশ পায়।

মনু তাঁর স্মৃতিতে শূদ্রকে নীচতা দেখাতে কোথাও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তেমনি ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠা করতে কোথাও ছাড়েননি। মনুস্মৃতির প্রতি শ্লোকে শ্লোকে ব্রাহ্মণের আধিপত্য তুলে ধরেছেন। উত্তম অঙ্গ মুখ থেকে সৃষ্ট হওয়ার কারণে এবং বেদকে ধারণ কারণে সমগ্র সৃষ্ট জগতে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ তিনি দেখিয়েছেন। এমনকি ভূতগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছেন –

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ, প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ, নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।।96।।

এই বর্ণের ভেদাভেদ করতে গিয়ে তিনি সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের মৌলিক অধিকার টুকুও কেড়ে নেন। এই ভেদাভেদ এতটাই তীব্র ছিল যে তিনি বর্ণানুসারে নামকরণও করতে পিছপা হননি। যেমন ব্রাহ্মণ মঙ্গলবাচক শব্দ ও শর্মযুক্ত। ক্ষত্রিয় রক্ষবাচক, বৈশ্য ধনবাচক এবং শূদ্রের ভৃত্যবাচক। আদি কাল থেকে এই ভেদাভেদ আমরা ক্রমশ লক্ষ্য করে আসছি।

মনুসংহিতা (বা মনুস্মৃতি) প্রাচীন হিন্দু আইনের একটি বিতর্কিত ধর্মশাস্ত্র, যা মূলত চতুর্বর্ণ প্রথা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) এবং কঠোর জাতিভেদ সমর্থন করে। এটি উচ্চবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শূদ্র-এর প্রতি বৈষম্যমূলক বিধি বিধানের জন্য পরিচিত যা আধুনিক ভারতীয় সংবিধানে SC / ST দের সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী এবং আম্বেদকর কর্তৃক নিন্দিত।

বর্তমান SC / ST ও মনুসংহিতা –

• বিবর্তন –

আধুনিক ভারতে ডঃ বি. আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে সংবিধান প্রণয়নের পর মনুসংহিতার জাতিভেদ ভিত্তিক আইন বাতিল করা হয়েছে।

• সাংবিধানিক অধিকার –

বর্তমান SC / ST (তফসিলি / উপজাতি) সংবিধানের আওতায় সম অধিকার, শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণ, যা মনুসংহিতার বর্ণপ্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী।

• প্রতিবাদ -

১৯২৭ সালে ডঃ আম্বেদকর মনুসংহিতার কপি পুড়েয়ে এর বর্ণবাদী ও শোষণমূলক নীতির প্রতিবাদ করেছিলেন। মনুসংহিতা প্রাচীন আইনের আকর গ্রন্থ হলেও বর্তমানে এটি কেবল একটি ঐতিহাসিক দলিল।

বর্ণপ্রথার সাম্প্রতিক প্রভাব-

বর্ণপ্রথা এখনও ভারতীয় সমাজে প্রভাব ফেলেছে, যদিও সংবিধানে এটি অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

• দলিত এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের বৈষম্য –

SC / ST সম্প্রদায়ের মানুষেরা এখনও শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

• বিবাহ এবং সামাজিক সম্পর্ক –

অনেক জায়গায় আন্তঃবর্ণবিবাহ এখনও গ্রহণযোগ্য নয়, এবং সামাজিক সম্পর্কগুলো বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত।

• রাজনীতি এবং ক্ষমতা –

বর্ণের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলো ভোট ব্যাংক তৈরী করে, এবং ক্ষমতার বন্টনেও বর্ণের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু এখনও অনেক জায়গায় বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। অনেক সময় SC / ST সম্প্রদায়ের মানুষেরা বেষম্যের শিকার হন।

গবেষণা এবং তথ্য –

• National Sample Survey Office (NSSO) এর তথ্য অনুযায়ী, SC / ST সম্প্রদায়ের মধ্যে দারিদ্রের হার বেশি।

• Indian Human Development Survey (IHDS) দেখিয়েছে যে, বর্ণভিত্তিক বৈষম্য গ্রামাঞ্চলে বেশি প্রকট।

• Ambedkar Periyar Study Circle বর্ণপ্রথার ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন –

- ডঃ বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে দলিত আন্দোলন ভারতের সংবিধানে বর্ণপ্রথা বিরোধী বিধান যুক্ত করতে সাহায্য করেছে।
- মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন দলিতদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করেছে।
- সাম্প্রতিক আন্দোলন যেমন – # Dalit Lives Matter এবং #Caste Matter সোশ্যাল মিডিয়ার বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।

Conclusion :

বর্ণপ্রথা হলো একটা প্রাচীন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে মানুষকে তাদের জন্ম, পেশা এবং সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে করা হয়েছে, সংবিধানে এই প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করলে তবুও এর প্রভাব এখনও ভারতীয় সমাজে দেখা যায়।

ভবিষ্যতের পথ –

বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা, সচেতনতা এবং সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে আমরা একটি সমান এবং ন্যায্য সমাজ গঠন করতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন –

• শিক্ষা এবং সচেতনতা –

মানুষকে বর্ণপ্রথার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষিত করা এবং সচেতন করা।

• সামাজিক সংস্কার –

সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংস্কার আনা, যাতে বর্ণপ্রথার প্রভাব কমানো যায়।

• আন্দোলন এবং কর্মসূচি –

বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং কর্মসূচী গ্রহণ করা।

Bibliography –

1. বসু, ডঃ অনিলচন্দ্র, মনুসংহিতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮ / ১ বিধান সরণি, কলকাতা – ৭০০০৬।
2. কুমার, ডঃ দীপক, এবং দত্ত ভট্ট, ডঃ সঞ্জয়, সংস্কৃতপ্রতিস্পর্ধাপ্রকাশ, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, চৌখম্বা পাব্লিশিং হাউস, ৪৬৯৭ / ২ নই দিল্লি ১১০০২, ২০২২।
3. বসাক, ডঃ রাধাগোবিন্দ, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট, কলকাতা – ১৩১৯৭০।
4. Agawala. R.K. "Hindu Law" 21st edn. Central Law Agency, Allahabad. 2003.